গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ গোপালগঞ্জ

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
গোপালগঞ্জ

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েবসাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ, ড. মোঃ লিয়াকত আলী ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান। অক্ষর বিন্যাস ও লে-আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় রয়েছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে গোপালগঞ্জ জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বিবিএস - এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে গোপালগঞ্জের উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১। বি.বি.এস., ২০০৩। কৃষি শুমারী ১৯৯৬, জেলা সিরিজ গোপালগঞ্জ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, এপ্রিল, ২০০৩।

২। ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৩। শিশু একাডেমী, ২০০৪। জেলা সংকলন। শিশু একাডেমী, গোপালগঞ্জ। গোপালগঞ্জ, ২০০৪।

৪। PDO-ICZMP, 2001. Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project, Bangladesh. Dhaka, August 2001.

৫। CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh, Final Report; Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৬। Khan, N. I., 1977. Bangladesh District Gajetteers Faridpur; Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, December 1978.

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলার মানচিত্র

সূচনা **১**
এক নজরে গোপালগঞ্জ ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৫**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৫
কৃষি সম্পদ ৯
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১০
বিপদাপন্নতা ১১

জীবন ও জীবিকা **১৩**
জনসংখ্যা ১৩
জনস্বাস্থ্য ১৩
শিক্ষা ১৪
সামাজিক উন্নয়ন ১৪
প্রধান জীবিকা দল ১৪
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৬
দারিদ্র্য ১৬

নারীদের অবস্থান **১৭**

অবকাঠামো **১৯**
রাস্তা-ঘাট ১৯
নৌ-পথ ১৯
পোল্ডার বা বাঁধ ১৯
হাট-বাজার ও বন্দর ১৯
বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ ২০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০
উপাসনালয় ২০
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ২০
হোটেল/অবকাশ কেন্দ্র ২০
শিল্পাঞ্চল ২০
সেচ ও গুদাম ২০
উন্নয়ন প্রকল্প ২০

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২৩**
পরিবেশগত সমস্যা ২৩
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৪
শিল্প বিষয়ক সমস্যা ২৪

সম্ভাবনা ও সুযোগ **২৭**
কৃষি ও অর্থনীতি ২৭
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ২৭
খনিজ সম্পদ ব্যবহার ২৮
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ২৮

ভবিষ্যতের রূপরেখা **২৯**

দর্শনীয় স্থান **৩১**

জেলা মানচিত্র

89°45'
89°55'
90°05' E
23° 20' N
23° 20'
23° 10'
23° 00'
22° 50'
89°50'
90°00'
FARIDPUR
Muksudpur
Old Kumar R
Kashiani
Basarater Khal
Gorai R
MADARIPUR
Mati Bil Route
Madumati R
GOPALGANJ
NARAIL
Kotalipara
Ghagar R
Hunda R
BARISAL
Tungipara
Kali Ganga R
BAGERHAT
PIROJPUR
BANGLADESH
Bay of Bengal
GOPALGANJ DISTRICT
4 0 4 8 km
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/Thana/Head Quarter
Railway Station
National Highway
Regional Highway
Feeder Road
Embankment
Broad Gauge Railway
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের একটি গৌরবময় জেলা হচ্ছে গোপালগঞ্জ। জেলার সভ্যতা-সংস্কৃতি সবই গড়ে উঠেছে নদ-নদীকে ঘিরে। জেলার নদ-নদী, বিল, বাঁওর, পুকুর প্রাকৃতিক রূপকে করেছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই জেলা ঢাকা বিভাগে অবস্থিত। জেলার দক্ষিণে পিরোজপুর ও বাগেরহাট, পশ্চিমে নড়াইল, উত্তরে ফরিদপুর এবং পূর্বে মাদারীপুর ও বরিশাল জেলা। এই জেলা পদ্মা-মেঘনার পলল ভূমি দ্বারা গঠিত। জেলার দক্ষিণ অংশের নদীগুলোতে জোয়ার-ভাটা হয়।

গোপালগঞ্জের নামকরণের সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায়নি। তবে ইতিহাস থেকে দেখা যায় ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গোপচন্দ্র নামে এক রাজা স্বাধীনভাবে এ অঞ্চল শাসন করতেন। তার রাজধানী ছিল কোটালীপাড়ায় ঘাঘর নদীর তীরে, যা সেই সময় 'চন্দ্রবর্মন কোট' নামে পরিচিত ছিল। সেই জনপদের চিহ্ন এখনও রয়েছে। তবে এর বহু নিদর্শন ঘাঘর নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। তিনি ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৫৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই এলাকা শাসন করেছেন। এরপর তার বংশধর ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব রাজত্ব করেছেন। তাই বলে গোপচন্দ্রের নামানুসারে যে গোপালগঞ্জের নাম হয়েছে এ কথা বলা যায় না। আজ থেকে দেড়'শ বছর আগে গোপালগঞ্জ "রাজগঞ্জ" নামে পরিচিত ছিল। রাজগঞ্জ তখন মধুমতি নদীর একটি পারঘাটা। এই পারঘাটাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে এখানে একটি বাজার গড়ে উঠে। দিনে দিনে তা হয়ে উঠে "গঞ্জ" এবং পরে তার নাম হয় "রাজগঞ্জ"। এই রাজগঞ্জ এক সময় মুকিমপুর স্টেটের অন্তর্গত ছিল।

এই "রাজগঞ্জ" যে কিভাবে গোপালগঞ্জ হয়েছে তার সঠিক তথ্য কেউ দিতে পারে না। তবে কেউ বলেন মুকিমপুর স্টেটের এক সময়কার জমিদার ছিলেন রানী রাসমনি, তিনি কোলকাতায় বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে তার এই জমিদারী দেখাশোনা করতে আসতেন। গোপাল নামে তার এক নাতিকেও সাথে নিয়ে আসতেন। তার নামানুসারে 'রাজ' শব্দটি বাদ দিয়ে এই স্থানের নাম গোপালগঞ্জ রাখেন। আবার অনেকে বলেন রানী রাসমনির নায়েব রজনী ঘোষের নাতি 'নব গোপাল'কে রানী খুবই স্নেহ করতেন এবং তার নামে রাজগঞ্জের নাম "গোপালগঞ্জ" রাখেন। গোপালের নামানুসারে গোপালগঞ্জ কিন্তু সেটা কি ৬ষ্ঠ শতকের রাজা গোপচন্দ্র, রাসমনির নাতি গোপাল, নাকি নায়েব রজনী ঘোষের নাতি নবগোপালের নামানুসারে হয়েছে তার সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

গোপালগঞ্জ এক সময় তৎকালীণ মাদারীপুর মহকুমার একটি থানা ছিল। পরবর্তীতে ১৯০৯ সালে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৩ সালে এখানে আদালত স্থাপন করা হয়। ১৯৮৪ সালে মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়।

উপজেলা	৫ টি
পৌরসভা	৪ টি
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	১০৫ টি
মৌজা/মহল্লা	৭১৩ টি
গ্রাম	৮৮০ টি

গোপালগঞ্জ জেলার মোট আয়তন ১,৪৯০ বর্গ কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের আয়তনের ১%। এলাকার বিচারে এই জেলা উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে ১৩তম স্থানে ও বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪৪তম স্থানে এবং ঢাকা বিভাগের ১৭টি জেলার মধ্যে ৮ম স্থানে অবস্থান করছে। ৫টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা, ৬৯টি ইউনিয়ন, ৩৬টি ওয়ার্ড, ৭১৩টি মৌজা, ৮৮০টি গ্রাম নিয়ে গোপালগঞ্জ জেলা। গোপালগঞ্জ সদর, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী, মুকসুদপুর আর টুঙ্গিপাড়া জেলার ৫টি উপজেলা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : জোয়ার-ভাটার প্রভাব, নোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্নিঝড় / জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে গোপালগঞ্জ জেলার সবক'টি উপজেলাকে অন্তর্বর্তী (Interior Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক নজরে গোপালগঞ্জ

	বিষয়	একক	গোপালগঞ্জ	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা / প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১৪৯০	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৫	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৬৯	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৪	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৩৬	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৭১৩	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৮৮০	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১১.৫২	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৫.৭৯	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৫.৭২	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৭৭৩	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০১	১০৫	১০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫.৩	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.১৭	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২.৬	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৯	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬৩	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১৩	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৮	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	১.০১	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৭৫	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	১,৬৮৭	৬৭,৮৮০	২৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৩,৪৫৭	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৫৮০	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৭	২৬	২৮	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩২	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৯	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৪৩	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	২১	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৭৮	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫১	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৪	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৭	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৫	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৩১	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৯	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৯৩	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯৩	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৪	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন / শয্যা	৫,৭৭৭	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬০	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯৬	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	১০	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৭	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	১২	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৪	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩৯	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- সাক্ষরতা হার (৫১%), জাতীয় (৪৫%) হারের তুলনায় বেশি ও উপকূলীয় (৫১%) অঞ্চলের সমান।
- প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৭৩ জন, যা জাতীয় ঘনত্বের (৮৩৯ জন) তুলনায় কম।
- জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা (৩৭.৯%) জাতীয় (৫২.৬%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৫৩.৫%) কম।
- জেলার মোট গৃহের মধ্যে ৯৩% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় (৮৮%) হারের তুলনায় বেশি।
- জেলার হাট বাজার কেন্দ্রগুলোর গড় দূরত্ব (৭৫ কি. মি.) জাতীয় গড় (৭০ কি. মি.) দূরত্বের তুলনায় বেশি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ কি. মি.) তুলনায় কম।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪ জন, যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম।
- রাস্তার ঘনত্ব (১.০১ কি. মি./বর্গ কি. মি.), যা জাতীয় (০.৭২ কি. মি./বর্গ কি. মি.) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি.মি./বর্গ কি. মি.) ঘনত্বের তুলনায় বেশি ।
- জেলায় দারিদ্র্যপীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৪২.৬%, ২০.৬%) জাতীয় (৪৮.৬%, ২৩.২%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১.৬%, ২৪%) তুলনায় কম।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৪.৯%), যা জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় (৫.৪%) অঞ্চলের হারের চেয়ে কম।
- জেলায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (৪৪%), যা জাতীয় (৩৬.৯%) হারের তুলনায় বেশি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৪৭.৬%) কম।
- জেলায় মাথাপিছু আয় (১৩,৪৫৭ টাকা) জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- মাথাপিছু শিল্প আয়ের ভাগ (১৬%) জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ৫,৭৭৭ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) ও উপকূলীয় (৪,৬৩৭) অঞ্চলের হারের তুলনায় নেতিবাচক।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ (১৩%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৬০) জাতীয় (প্রতি হাজারে ৪৩) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৯%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।
- জেলা শহুরে জনসংখ্যা (৯.২৭%) জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলায় মধ্যম মাত্রায় লিঙ্গীয় অসমতা।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	গোপালগঞ্জ	উপজেলা					তথ্য সূত্র ও বছর
				সদর	কোটালীপাড়া	কাশিয়ানী	মুকসুদপুর	টুঙ্গিপাড়া	
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১৪৯০	৩৯১	৩৬২	৩০০	৩১০	১২৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন / ওয়ার্ড	সংখ্যা	১০৫	৩০	২১	১৪	২৬	১৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৭১৩	১৭৮	১১১	১৫৫	২২২	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৮৮০	১৯৭	১৯৭	১৬৩	২৫৪	৬৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১১.৫২	৩.২০	২.২৭	২.৩০	২.৭৮	০.৯৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৫.৭৯	১.৬০	১.১৩	১.১৩	১.৪২	০.৪৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৫.৭২	১.৫৯	১.১৪	১.১৬	১.৩৬	০.৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৭৭৩	৮১৯	৬২৮	৭৬৯	৯০১	৭৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০১	১০১	৯৯	৯৮	১০৪	১০৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.১৭	০.৫৯	০.৪২	০.৪৪	০.৫৪	০.১৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৫.৩	৫.৪১	৫.৩০	৫.২২	৫.১৪	৫.৫৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	২.৬	২.৩	২.৮	৩.২	২.৮	২.১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৯	৩২	২৬	৩০	২৯	২৫	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬৩	৬৫	৫৯	৬০	৭০	৫৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩	৬.০০	০.৬৪	১.৭০	২.১১	২.০১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৮৭৮	২৫৫	১৮৩	২২০	১২৮	৯২	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৮২	৪৫	৪২	৩৬	৪১	১৮	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৮	৫	৪	৪	৪	১	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৩২	৩০	৩২	৩৩	৪০	৩১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৭৫	৭৭	৮৩	৭২	৭১	৭৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	২৫	২৩	১৭	২৮	২৯	২২	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	৯৯৪৮০	২৬,০৫২	২৩,৩৮৫	১৯,৩৬৪	২১,৯৮১	৮,৬৯৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৩৭	২৭	৬৬	২৬	**তথ্য নাই**	২৯	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৫০	৫১	৩১	৬৫	**তথ্য নাই**	৫১	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৩	২২	৩	৮	**তথ্য নাই**	২১	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৬,০০০	৮,৫০০	৭,৫০০	৩,৫০০	৩,৫০০	৩,৫০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	%	৫১	৫৪	৪৮	৫৩	৪৬	৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৭৮	৯৪	৯৯	৯৭	৩৯	৮৪	২০০১(প্রা.শি.অ)
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৮১	৯৯	৯৬	১০৭	৩৮	৮৭	২০০১(প্রা.শি.অ)
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৪,১২১	৩,২৩৮	৩,৬৩৮	২,৬২৫	২,৯৮৮	১,৬৩২	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৯	৯২	৮৮	৯১	৯২	৬৮	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৭	৯	১০	৫	৩	৭	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

নদী-নালা, খাল-বিল ও জলাশয় নিয়ে গোপালগঞ্জ জেলার একটি নিজস্ব পরিবেশ আছে। এক সময় প্রমত্তা মধুমতি নদী আর বিল ও বাওড় ঘেরা এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। পুরো জেলাই ছিল জলাভূমি। সময়ের পরিবর্তনে জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুযোগ হয়েছে চাষাবাদের এবং সারা বছর নদী-নালা ও খাল-বিলে পানি থাকায় মাঠে ফলে বিভিন্ন ফসল। মানুষ তাদের বাড়ির আশপাশে লাগাচ্ছে বিভিন্ন রকমের গাছ।

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-আরিয়াল খাঁ-মধুমতি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই জেলা পদ্মা আর মেঘনার পলি মাটিতে গড়া। শত শত বছর ধরে গভীর জলাভূমিতে বিভিন্ন জাতের জলজ উদ্ভিদ পঁচে পঁচে এই ভূমি গঠিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জলবায়ু : বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত এ জেলাও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রায় ৮৬% বর্ষণ এই সময় হয়। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বর মাসে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এ মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল; কখনো কখনো সামান্য বৃষ্টি হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক-বর্ষাকাল বলে ধরা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এং বাতাসে জ্বলীয়বাষ্প খুব কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে কালবৈশাখী বলা হয়। এ সময় শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

জেলায় নিম্নতম তাপমাত্রা ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পরিলক্ষিত হয়, যার গড় প্রায় ১২.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এপ্রিল মাসে ৩৬.১ ডিগ্রী এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসে ৯.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে।

ভূ-প্রকৃতি/মাটি : গোপালগঞ্জ জেলা ৫টি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত, যথা (ক) গাঙ্গেয় পললভূমি, (খ) মিশ্র গাঙ্গেয় ও মেঘনা খাড়ি পললভূমি, (গ) মেঘনা খাড়ি পললভূমি, (ঘ) মিশ্র মেঘনা খাড়ি পললভূমি ও জৈব মাটির বিলাঞ্চল এবং (ঙ) জৈব মাটির বিলাঞ্চল।

গাঙ্গেয় পললভূমি : জেলার বেশ কিছু এলাকা গাঙ্গেয় পললভূমি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত। এ এলাকাটি মধুমতি নদীর পাশ দিয়ে প্রসারিত। মাটির কোন না কোন স্তর সাধারণত চুনযুক্ত। সমগ্র এলাকাটি সমতল ও অগভীর ডাংগা এবং বিল নিয়ে গঠিত। উঁচু ডাংগাগুলো বর্ষার পানিতে প্লাবিত হয় না। নিচু ডাংগাগুলো দোআঁশ ও এটেল এবং বিল এলাকা এটেল মাটি দ্বারা গঠিত হয়েছে।

মিশ্র গাঙ্গেয় ও মেঘনা খাড়ি পললভূমি : এই এলাকাটি গাঙ্গেয় পললভূমি ও মেঘনা খাড়ির পললভূমির মাঝে স্থানে বিস্তৃত। মাটির কিছু অংশ গাঙ্গেয় পললভূমি এবং কিছু অংশ মেঘনা খাড়ি পললভূমির অনুরূপ। তবে সব জায়গাতেই মাটির নিচের অংশে মেঘনা খাড়ি পললভূমি দেখা যায়।

এলাকাটি সমতল। প্রধানত বিলাঞ্চল ও কিছু কিছু নিচু ডাংগা ভূমি নিয়ে গঠিত। বর্ষাকালে ডাংগা ভূমি অগভীরভাবে এবং বিলাঞ্চল গভীরভাবে প্লাবিত হয়।

মেঘনা খাড়ি পললভূমি : গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা মেঘনা খাড়ি পললভূমি দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের মাটি প্রকৃতিগতভাবে চুনবিহীন (বাংলাদেশ মৃত্তিকা জরীপ বিভাগ)। এ অঞ্চলটি প্রায় সমতল নিচু ডাংগা ও প্রশস্ত বিল নিয়ে গঠিত। বর্ষাকালে ডাংগা ভূমি অগভীরভাবে ও বিল গভীরভাবে প্লাবিত হয়।

মিশ্র মেঘনা খাড়ি পললভূমি ও জৈব মাটির বিলাঞ্চল : জেলার একটি বড় অংশ এই ভূ-প্রকৃতি দ্বারা গঠিত। বিশেষ করে গোপালগঞ্জ সদর, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী উপজেলায় এই ধরনের ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। এই সব এলাকা মাঝামাঝি সমতল, মাঝারি নিচু ও নিচু এলাকা নিয়ে গঠিত।

জৈব মাটির বিলাঞ্চল : এই এলাকা মাঝারি থেকে অতি গভীর। এখানে অনেকগুলো বড় বড় বিল দেখা যায়। প্রায় ৫ হাজার বছর ধরে গভীর জলাভূমিতে বিভিন্ন জাতের জলজ উদ্ভিদ পঁচে এ জৈব ভূমি গঠিত হয়েছে। মাটির বৈশিষ্ট্য বিচিত্র ধরনের। কোথাও কোথাও মাটির উপরের দিকে আধা পচনশীল অথবা পচনশীল জৈব পদার্থ সম্বলিত পিট অথবা মাক রয়েছে। আবার কোথাও কোথাও মাটির গভীরে পিট বা মাক দেখা যায়। এ মাটির ভারবহন ক্ষমতা কম। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কম ও নিচু হওয়ার কারণে এ এলাকাটি প্রায় সারা বছরই ভিজা বা পানির নিচে থাকে।

নদী ও খাল-বিল : গোপালগঞ্জ জেলার প্রকৃতি খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় আর নদী নির্ভর। এক সময়ের প্রমত্তা মধুমতি আর তার শাখা নদীগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সর্বত্র। সেই মধুমতি সরে এসে এখন নড়াইল সীমান্তে মিশেছে। বর্ষাকালে পানি প্রবাহ থাকে আবার শুষ্ক মৌসুমে স্থবির হয়ে যায়। জেলার নদীগুলোর মোট দৈর্ঘ্য ১৪৫ কি. মি., যা প্রায় ৩২ বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে আছে। এই জেলার প্রধান কয়েকটি নদী হলো মধুমতি, ঘাঘর, কুমার, বারাসিয়া এবং বিলরুট ক্যানেল বা কাটা মধুমতি।

মধুমতি : পদ্মার একটি প্রধান শাখা নদী মাগুড়া জেলার মোহাম্মদপুর পর্যন্ত গড়াই নামে প্রবাহিত হয়েছে। এখান হতে নদীর নাম হয় মধুমতি। আরো এগিয়ে গিয়ে কচুয়ার কাছে এ নদীর নাম হয় বলেশ্বর। এই নামটিও বেশ অর্থবহ (যুবপ্রভু)। এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭২ কিলোমিটার। তন্মধ্যে গড়াই নামে ৮৯ কি.মি., মধুমতি নামে ১৩৭ কি.মি. এবং বলেশ্বর নামে ১৪৬ কি. মি.।

বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা ও যশোর জেলার সীমানা চিহ্ন আঁকতে আঁকতে কত না বিচিত্র বাহারি সব গঞ্জ, বন্দর, নগর, জনপদে প্রাণের স্পর্শ বুলিয়ে প্রবাহিত এ নদী। এক সময় বড় বড় লঞ্চ, স্টিমার, শীপ, কার্গোসহ বিভিন্ন জাহাজের চলাচলে মুখরিত ছিল এ নদী। চলাচল করতো বেপারীদের পণ্য বোঝাই ফরিয়া, কাঠামী, ঘষী, রাজা-জমিদারদের বজরা, পানসি, গণমানুষের নৌকো গয়না, ছিপ, বাইচা, দো-মাল্লাই, এক-মাল্লাই, টাপুরিয়া, ডিঙ্গি, ডোঙ্গাসহ বিভিন্ন মধুময় নামের বর্ণিল সব নৌকো।

তবে ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে এক সময়ের প্রমত্তা নদী মধুমতি হারিয়েছে তার যৌবনের লাবণ্য। প্রশস্ততার সাথে সাথে গভীরতা হারিয়ে জায়গা বিশেষে ক্ষীণকায় হয়ে খালের মত হয়েছে। মধুমতি নদীর সাথে সাথে দু'পাড়ের অনেক নগর, জনপদ, গঞ্জও হারিয়ে যাচ্ছে।

ঘাঘর নদী : প্রাচীন বাংলার রাজধানীখ্যাত ঐতিহাসিক 'চন্দ্রবর্মন কোট' তথা বর্তমান কোটালীপাড়ার ভিতর দিয়ে প্রবাহমান 'সুবর্ণ রেখার' মতই কালের আর এক স্রোতধারা 'ঘরঘরা বা ঘাঘর নদী'। খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকে ঘাঘর নদীকে

কেন্দ্র করেই এখানে গড়ে উঠেছিল নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা। ঘাঘর, শাদুল্লাপুরসহ কত জানা অজানা নগর জনপদ। এসব জনপদের পুরাতাত্ত্বিক অনেক মূল্যবান প্রত্নরাজি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

কুমার নদী : ঐতিহাসিক কুমার নদী ফরিদপুর হয়ে দীর্ঘ পথ এঁকেবেঁকে জেলার মুকসুদপর উপজলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এই কুমার পাড়েরই একটি জায়গার নাম; এ নদীর পাড়ে রয়েছে উজানী রাজবাড়ী। কুমার নদী পৃথিবীকে আড়াই প্যাচ দিয়েছে বলে লোককথা প্রচলিত রয়েছে। কালের কুটিল কটাক্ষে কুমার নদীও হারাতে বসেছে তার যৌবনের প্রশস্ততা, সহজাত লাবণ্য এবং নাব্যতা।

বারাসিয়া নদী : সপ্তদশ শতকের রামরাজ্যখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী মুহম্মদপুর (বর্তমান মুকসুদপুর উপজেলা সদর)-এর প্রান্ত ছুঁয়ে প্রবাহিত কালের কল্লোলিত নদী বারাসিয়া। নদীটি এঁকেবেঁকে পার্শ্ববর্তী বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা হয়ে জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালনা ঘাটের অদূরে মধুমতির সাথে মিলিত হয়েছে। এখনও কাশিয়ানী এলাকার কিছু কিছু অংশে বারসিয়া নদীকে নদী মনে হলেও অপরাপর দীর্ঘ এলাকা জুড়ে শীর্ণকায় হতে হতে খালের পর্যায়ে এসেছে এক কালের যৌবনবতী নদী বারাসিয়া।

বিলরুট ক্যানেল বা কাটা মধুমতি : নদীপথ কমিয়ে এনে এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী পরিবহনের সুবিধার জন্য মধুমতির মানিকদাহ বন্দরের নিকট থেকে উত্তর এবং উত্তর পূর্বদিক বরাবর উরফি, ভেড়ার হাট, উলপুর, বৌলতলী, সাতপাড়, টেকেরহাট হয়ে উতরাইল বন্দরের কাছাকাছি পর্যন্ত প্রায় ৬০/৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ক্যানেলটি খনন করা হয়। ১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে এই খালটি কাটা হয়। খালটি ৪০০ ফুট প্রশস্ত এবং ৩০ ফুট গভীর। তৎকালীন সময় খালটি খননের জন্য ব্যয় হয় ৩৩,৬৬,৮৭৬ টাকা। এ খাল খননের ফলে নদীপথে ঢাকা-খুলনার দূরত্ব ১৫০ মাইল কমে যায় এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে আসা পণ্য সহজেই কলকাতা বন্দরে পাঠানো যায়। এটি বঙ্গের সুয়েজ খাল নামে পরিচিত। ইংরেজ আমলে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নির্মাণ কাজের সাথে এ কাজটিকে তুলনা করা হতো।

প্রথমদিকে ক্যানেলটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপর ছিল। পওে ১৯৬৩ সালে মাদারীপুর বিল রুটের দায়িত্বভার বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে এই বিলরুটের সংরক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

মাদারীপুর বিলরুট একটি ব্যস্ত জলপথ। খুলনা হতে চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা যাওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত নৌ-পথ। এর গতিপথ মোটামুটি সরল। তবে মাঝে মাঝে ভাঙন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর প্রচুর পরিমাণ পলি পরার ফলে প্রায়ই চরের সৃষ্টি হয়। ফলে শুকনো মৌসুমে নৌ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। খুলনা-ঢাকার সংযোগকারী এই রুটের উপর মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অংশ বিশেষের নৌ চলাচল, ব্যবসা ও আর্থ-সামাজিক জীবন নির্ভরশীল।

বর্ণি বাওড় ও বাঘিয়ার বিল : 'সাগর' শব্দটির গ্রামীণ লোকভাষা বা ব্রাত্যরূপ 'হাওড়' এর প্রতিশব্দ বাওড় বলতে মূলত সাগরের বিস্তৃতি বোঝায়। জেলার টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর এবং কাশিয়ানী উপজেলার বিশাল এলাকায় এক সময় বর্ণি বাওড় বিস্তৃত ছিল। পার্শ্ববর্তী বাঘিয়ার বিলের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় আয়তনে বিশাল ছিল এই বর্ণি। তখন ঘোনাপাড়া এলাকায় মধুমতি নদীর সাথে বাওড়ের সংযোগ ছিল সুতিয়া নদীর মাধ্যমে। দিনে দিনে সংযোগটি ভরাট হয়ে বর্ণি বাওড়ে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। ৫০/৬০-এর দশকে মধুমতি নদীর সাথে পাটগাতি বাজারের কাছে (টুঙ্গীপাড়া) ৫/৬ মাইল দৈর্ঘ্যের একটি নদী খনন করা হয়। নদীটি বাঘিয়ার বিলের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় বাইগার নদী নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। মধুমতির পলিমিশ্রিত জোয়ার-ভাটা বাইগার নদীতে প্রবাহিত থাকায় বর্ণির বাওড়ের নাব্যতা কমেছে। বাওড় ও সংযুক্ত বিলের বিশাল এলাকার চার পাশে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে চৌহদ্দি এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। প্রতিনিয়ত একটু একটু করে চাষের আওতায় আসছে

বাওড়ের প্রান্তবর্তী জমি। ফলে প্রকৃতির লীলাভূমি বর্ণির বাওড় ও বাঘিয়ার বিল ক্রমান্বয়ে হয়ে পড়েছে সংকুচিত। এক সময়ের মেছো কুমির, বিশাল আকৃতির বিভিন্ন দেশী মাছ এখন আর তেমন একটা চোখে পড়ে না।

চান্দার বিল : দেশের বৃহত্তম বিলসমূহের মধ্যে চান্দার বিল অন্যতম। কথিত আছে পৌরানিক চাঁদ সওদাগর এই বিলের উপর দিয়ে তার পণ্য বোঝাই ডিঙ্গা নিয়ে যাতায়াত করতেন পার্শ্ববর্তী চান্দের হাটে। বিলের বিশালতা এবং গভীরতা এতটাই ছিল যে, সে সময় শুকনো মওসুমেও কেউ বিলের তল দেখেনি। এক সময়ে ঝড়ে পতিত হয়ে চাঁদ বেনের ডিঙ্গা ডুবে যায় এ বিলে। সেই থেকে চাঁদ বেনের স্মৃতি জড়িয়ে বিলের নামকরণ হয় চান্দার বিল। নিকট অতীতেও পূর্বে জলির পাড়, উত্তরে মুকসুদপুরের উজানী, পশ্চিমে রাহুখড় এবং দক্ষিণে নিশ্চিন্তপুর ছিল চান্দার বিলের সীমানা। সময়ের বিবর্তনে বিলের বেশিরভাগ জমিতে এখন ফসলের চাষ হয়। চারদিকে গড়ে উঠেছে অনেক গ্রাম। তারপরেও আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বিলের উপর নৌকা ভাসালে এর বিশালতা দেখে চমকে উঠতে হয়।

এ ছাড়াও জেলার সিংহভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে প্রসিদ্ধ অনেক বিল-ঝিল। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এসব বিলের মধ্যে গাজনার বিল, দরিয়ার কূল, সোনাখালী বিল, জলির পাড়া, কাজুলিয়া বিল, পোড়াডাঙ্গার বিল, হাটবাড়িয়ার বিল, মোল্লার বিল, লক্ষ্মীডাঙ্গার বিল উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : জেলার জলবায়ু ও মাটির ধরন এখানকার উদ্ভিদ ও জীব জগতে বৈচিত্র্য এনেছে। জেলার উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেয়া হলো।

উদ্ভিদ : গোপালগঞ্জ জেলার সর্বত্র বিভিন্ন রকমের দেশীয় গাছ-গাছালি দেখা যায়। আর মিঠা পানি ও পলি মাটির কারণে অতি সহজে ফসল ও গাছ-গাছালি বেড়ে উঠে। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই ঝোঁপঝাড়, বাঁশঝাড়, কলারঝাড়, নারিকেল, সুপারি গাছ রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যে সকল গাছ রয়েছে এই জেলায়ও সেগুলো দেখা যায়। যেমন আম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, আতাফল, শরিফা, কামরাঙ্গা, পিতরাজ, সুপারি, নিম, কড়ই, টল্লাবন, হিজল, অরিআম, শিমুল, বিলাতিগাব, পলাশ, পেপে, সোনালু, জামবুরা, মান্দার, বট, অশ্বথ, ডুমুর, জারুল, দেশী গাব, চালতা, জলপাই, আমড়া, সাজনা, খেজুর, দেবদারু, পেয়ারা, রেইনট্রি, জাত করাই ইত্যাদি।

স্থানীয় প্রাকৃতিক উদ্ভিদের মধ্যে নল খাগড়া, হোগলা পাতা, বেতী পাতা, কাশবন ইত্যাদি দেখা যায়। এ ছাড়াও এই জেলার বিল-বাওড় ও ছোট ছোট জলাভূমিতে বর্ষাকালে প্রচুর শাপলা-শালুকের গাছ ও ফুল দেখা যায়।

প্রাণী : এই জেলায় বিভিন্ন জাতের প্রাণী দেখা যায়। যেমন বানর, মেছো বিড়াল, বাগডাসা, খাটাস, গন্ধগোকূল, ছোট বেজী, সাধারণ বড় বেজী, পাতিশিয়াল, খেকশিয়াল, উদ বিড়াল বা উদ বা ধাড়ে, কলাবাদুড়, মধ্যম আকারের বাদুর, ভুয়া রক্ত চোষা বাদুড়, চামচিকা, ব্রাশলেজা সজারু, চুড়াহীন হিমালয়ী সজারু, বাটা, কালো ইঁদুর, বাইট্যা বা নেংটি ইঁদুর, ব্যান্ডীকোটা ইঁদুর, ছোট ব্যান্ডিকোটা ইঁদুর, চিকা, পদ্মা শুশুক ইত্যাদি।

এই জেলায় সরিসৃপের মধ্যে দেখা যায় সুন্দি কাছিম, কাউটা কাছিম, মগম কাছিম ও দুরা, টিকটিকি, রক্তচোষা, তক্ষক বা তক্ষণাথ, আর্জিনা, গুইসাপ, দেয়াল টিকটিকি, একচক্র জাতিসাপ, দ্বিচক্র জাতিসাপ, শঙ্খীনি বা সাপনী বা মামা ভাগনে বা দুমুখো সাপ, কেউটে, ঢোড়া সাপ, মাইটে সাপ, মাছো রাঙ্গা সাপ, দাড়াস বা ধামন সাপ, লাউডগা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে জাতি, শঙ্খিনী, কেউটে, চন্দ্র বোড়া বিষধর সাপ।

এই জেলায় বহু পাখ-পাখালি দেখা যায়। পাখীদের মধ্যে রয়েছে ডুবুরী, ছোট পানকৌড়ি বা ছোট পানকামড়ি, গয়ার বা সাপ পাকি, কর্চি বক বা গুজা বক, মহিষে বক বা গো বক, ডাড় বক বা ধলি বক, মাঝারি বক, চোট বক, নিশাবক বা অক, রঙ্গিলা বা সোন ডঙ্গা, ঘোঙটা বা বাচি চোরা (চামচ মুখি), ভবন চিল, শঙ্ক চিল বা লাল চিল, কোরা, ডাহুক, কোরা, কালো কুট, জলপিপি, লাল হোট টিটি, হলুদ হোটাটিটি, জল চা পাখি, সুচ লেজা চ্যাগা,

বাটান, রঙিগলা চ্যাগা, পদ্মা জল কবুতর, কালো মাথা জল কবুতর, মাছ খেকো গাঙ চিল, কালচে গাঙ চিল, কপোত বা বুনো কবুতর, সবুজ কবুতর বা হরিয়াল, সবুজ ঘুঘু, লাল ঘুঘু, রাজ ঘুঘু বা ধোরাল ঘুঘু, টিলা ঘুঘু, চোখ গেলো, বউ কথা কও, পাপিয়া, কালো কোকিল, কানা কোয়া, লক্ষী পেচা (ভুতুম পেচা), কাঠুরে পেচা বা ছিা যুক্ত পেচ, রাত চরা, নাককাঠি, আবাবিল, পাকরা মাছরাঙা, জবুজ সুই চোর, নীল কণ্ঠ, হুদ হুদ, ছোট ভগীর বা বসন্ত বাউরী বা কপার স্মিথ, বড় ভগীরথ, নীলগলা ভগীরথ, মেঠো কুড়ালী বা কাঠ ঠোকরা, সবুজ কুড়ালী, ক্ষুদে সোনালী কুড়ালী, বড় সোনালী কুড়ালী, পূবে আকাশি ভরত, সাধারণ সোয়ালো, বাঘাটিকি, বাদামী কসাই পাখি, কালোমাথা হলদে পাখি বা হলুদিয়া পাখি বা বেনে বউ, কালো ফিঙ্গে, গুবরে মালিক, কাঠ শালিক, ভাত শালিক, ঝুট মালিক, তাড়ুয়া বা হাড়ি চাচা, পাতি কাক, দাঁড় কাক, ক্ষুদে সাত সেলি, ফটিকজল, সিপাহী বুলবুল, বুলবুল, লাল বুক চোটক, সাদা ভুরু বরন বাটা, টুনটুনি, সবুজ পাতা ওয়ার্বলার, বাদামী পাতা ওয়ার্বলার, দোয়েল, সাতেরি, সাত ভাইলা, ধুসর টিট, বাদামী উড নাটাক, গেছো পিপিট, সাদা খঞ্জনা, হলুদ মাথা খঞ্জনা, ফুলচুষি, বেগুনী মৌচুষি, বেগুনী পুচ্ছ ভিত্তি মৌচুষি, ছিটামুনিয়া লাল মুনিয়া, বাবুই বা বয়নকারী পাখি, চড়ুই ইত্যাদি।

শীতকালীন কিছু অতিথি পাখী আসে। বিশেষ করে মধুমতি নদী, বাঘিয়ার বিল ও চান্দার বিলে। শীতকালীন পাখিদের মধ্যে বুনো রাজ হাঁস, ছোট সরাল বা মরাল, বড় সরাল বা মরাল, বামন হাঁস, বালি হাঁস, চখাচখি ইত্যাদি দেখা যায়।

বনজ সম্পদ : গোপালগঞ্জ জেলায় কোন সংরক্ষিত বনভূমি নেই।

খনিজ সম্পদ : গোপালগঞ্জ জেলার চান্দার বিল ও বাঘিয়ার বিলে পিট কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । এই জেলায় প্রায় ১৫০ মিলিয়ন টন পিট কয়লার মজুদ রয়েছে। এই কয়লা এখনও তোলার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি (সূত্র : বি.বি.এস., ১৯৯৯)।

কৃষি সম্পদ

প্রধান ফসল : গোপালগঞ্জ জেলায় উৎপাদিত প্রধান ফসল হচ্ছে - ধান, তৈল বীজ, ডাল ও গম। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণ শাক-সবজি এখানে উৎপাদিত হয়। বিল এলাকায় একফসলী জমিতে বিভিন্ন জাতের আমন ধান যেমন লক্ষী দিঘা, কাকা দিঘা, খৈইয়ামোটর, জাবরা, নোতা, রেতপাশা, গৌর-কাজল, বেতক, জয়না প্রভৃতি বাহারী ধান হয়। কার্তিক থেকে অগ্রহায়ন মাসে আমন ধান কাটা হয়। কাশিয়ানীর উঁচু এলাকা পশ্চিম গোপালগঞ্জ, রঘুনাতপুর, গোবরা, বোড়াষী, চুঙ্গিপাড়ার কুশলী, সিঙ্গিপাড়া, রামচন্দ্রপুর, বাগুড়িয়া, গিমাডাঙ্গা এই সব উঁচু এলাকার কাইতান ফসল বা রবিশস্য যেমন সরিষা, মসুরী, মটর, খেশারী, বুজি সোলা, বুট প্রভৃতির ব্যাপক চাষাবাদ হয়। একই সময় কড়পাড়া, বৌলতলী, সাতপাড়, দূর্গাপুর প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর পরিমাণ চীনাবাদাম উৎপাদিত হয়। এই সব জমিতে মাঘ-ফাল্গুনে রবি শস্য ওঠে যাওয়ার পরে তিল এবং আউশ ধানের মিশ্র চাষ হয়। আউশ ধানের বিভিন্ন জাতের মধ্যে আছে শ্যবিইলাম, নড়ই, নোনছাড়া, রতইল, ষাইটা। বর্তমান সময়ে উফসি জাতের ইরি এবং হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ জেলা খাদ্য শস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জেলার প্রায় সকল এলাকায় উন্নত সেচ সুবিধায় কৃষক উফসি জাতের ধান আবাদে ঝুঁকে পড়েছে।

জেলার সবজি উৎপাদনে রঘুনাথপুর, সিলনা, গুয়াধানা, রূপাহাটি, গোপালপুর ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া, দাড়িযারকুল, বালারগাতী প্রভৃতি এলাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করলা, ঢেঁড়স, লাউ, কুমড়া, কচু এবং বিভিন্ন প্রকার

শাক-সবজি এখানে প্রচুর উৎপাদন হয়। ইদানীং কোটালীপাড়ার কলাবাড়ী, রাধাগঞ্জ, ভাঙ্গারহাট এবং গোপালগঞ্জের গোপীনাথপুর এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে প্রচুর পরিমাণ তরমুজ এবং বাঙ্গি উৎপাদন হয়।

মৎস্য সম্পদ : এই জেলার চারদিকে হাওড়-বাড়র আর বিল এবং নিচু এলাকা বর্ষাকাল এলেই পানিতে ডুবে যায়। আর রয়েছে পদ্মা-গড়াই-মধুমতি নদী। ফলে জেলার নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও পুকুরে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এ সকল মাছ হচ্ছে - কই, শিং, মাগুর, চাপিলা, কাচকি, ফ্যাসা, চিতল, ফলি, রুই, কাতল, ঘনিয়া, কালিবাউশ, নানদিনা, মৃগেল, রায়েক, ঘেসো রুই, সরপুটি, চোলাপুটি, তিতপুটি, ফুটনী পুটি, দেতো পুটি, কোসাপুটি, কাঞ্চন পুটি, মলা, নারকেলি চেলা, ছ্যাপচেলা, বাশঁপাতা, গুজি আইর, তল্লা আইর, গোলসা টেংরা, গুলো টেংরা, বুজুরী টেংরা, কাউনে, রিটা, রোল, গাউড়া, কাজলি, বাচা, সিলেন্দা, পাঙ্গাস, গজার, শোল, টাকি, তেলো টাকি, কুচে, টাকা চান্দা, ভেদা, নাপতে কতই, তুপ্তবেলে, বেলে, খলিসা, বইচা, খল্লা, কেচি খল্ল, তপসে, বড় বাইন, গুটি বাইন, তার বাইন, টেপা ইত্যাদি। এ ছাড়াও একসময় বিলে বাওড়ে প্রচুর কই, শিং, মাগুর পাওয়া যেত। এই জেলার মাছ সমগ্র বাংলাদেশের জেলাগুলোতে রপ্তানি হত। তবে বর্তমানে বিভিন্ন কারণে জেলার মাছের পরিমাণ খুবই কমে গেছে।

মাছ চাষ : এ জেলায় ২,৪৭৩ হেক্টর পুকুর আছে। এর মধ্যে ১,১৪৫ হেক্টর পুকুরে মাছ চাষ হয়। চাষাবাদ যোগ্য পুকুর আছে ৮৪৯ হেক্টর এবং পতিত আছে ৪৭৯ হেক্টর। এর মধ্যে ১,১৪৫ হেক্টর পুকুর থেকে উৎপাদন হয় ৩,১৫২ মে. টন মাছ। চাষাবাদযোগ্য পুকুর থেকে উৎপন্ন হয় ১,৫৪৮ মে. টন এবং পতিত পুকুর থেকে উৎপন্ন হয় ৩২৮ মে. টন। মোট উৎপন্ন হয় ৫,০২৮ মে. টন (সূত্র : মৎস্য বিভাগ ২০০৩) ।

পুকুরে মোট উৎপাদন		
	জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে.টন.)
মোট পুকুরের পরিমাণ	২৪৭৩	৫০২৮
মাছ চাষের পুকুর	১১৪৫	৩১৫২
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	৮৪৯	১৫৪৮
পরিত্যক্ত পুকুর	৪৭৯	৩২৮

পুকুরে যে ধরনের মাছ চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে রুই, কাতল, মৃগেল, গ্রাসকার্প, কালি বাউশ, সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সমুদ্র তীরবর্তী না হলেও গোপালগঞ্জ জেলার মানুষকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, বন্যা, কালবৈশাখী ও টর্নেডোর সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয়। বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি বর্ণনা নিচে দেয়া হল।

বন্যা : বিল-বাওর, খাল, নদী নিয়ে সমতল এবং নিচু এলাকা গোপালগঞ্জ জেলা। বর্ষা মৌসুমে উজানে অতি বৃষ্টি হলে এবং পদ্মা, যমুনার পানি বিপদসীমার উপরে উঠলে এই জেলায় বন্যা দেখা দেয় এবং জেলার ফসল নষ্ট হয়, বাড়িঘরে পানি উঠে। নিচু এলাকা হওয়ার কারণে বন্যার পানি সরে যেতে দেরী হয়। গোপালগঞ্জ জেলায় ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৭, ১৯৯৮ সালে ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

কালবৈশাখী/শিলা বৃষ্টি : কালবৈশাখী এবং শিলাবৃষ্টি গোপালগঞ্জ জেলার কৃষকদের জন্য মহা দুর্যোগ বয়ে আনে। এই জেলার বেশির ভাগ জমিতে একটি মাত্র ফসল উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান জন্মে। কালবৈশাখী এবং শিলা বৃষ্টিতে বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে এই জেলায় শীলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখীতে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল (সূত্র : গোপালগঞ্জ স্থানীয় পত্রিকা)।

আগাম বর্ষণ : সমতল নিচু ভূমি এই জেলা। জেলায় একটু বৃষ্টি হলেই নিচু এলাকার ফসল ডুবে যায়। তাই এই জেলায় গ্রীষ্ম মৌসুমে আগাম বর্ষণ হলে বিল-বাওড়ের বোরো ফসল পানিতে ডুবে যায়। অপরিকল্পিত রাস্তা, বাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণের ফলে জেলার পানি সহজে নেমে যেতে পারে না, ফলে ফসলের ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড় : এই জেলা প্রত্যক্ষ সমুদ্র উপকূলে না হলেও জেলায় বেশ কয়েকবার ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। জেলায় ১৯৭৭ সালের ৩রা এপ্রিল একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় আঘাত করে। তাতে গোপালগঞ্জ শহরসহ আশপাশের বহু ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। এ ছাড়াও বাংলা ১৩২৬ সালের ৩রা আশ্বিন ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৮০% লোকের ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায় (সূত্র : জেলা সংকলন) ।

জলাবদ্ধতা : জেলার বেশির ভাগ এলাকাই নিচু। জেলার বেশির ভাগ প্লাবন ভূমিতে বৈশাখের শেষে পানি জমে যায় এবং অগ্রহায়ন পর্যন্ত পানিতে ডুবে থাকে। কেবলমাত্র গ্রীষ্ম মৌসুমের প্রথম দিকে জেলার দক্ষিণ সীমানার কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় জোয়ার-ভাটা দেখা যায়।

বিল-নদী ভরাট : এক সময় মধুমতি, ঘাঘর, কুমার নদী দিয়ে দেশি বিদেশী জাহাজ চলাচল করত। কিন্তু এখন আর তা দেখা যায় না। উপরন্তু শুষ্ক মৌসুমে সাধারণ নৌকা চলাচলও অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়।

জেলার জলাভূমিগুলো দিন দিন পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভিটা-বাড়ি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংকুচিত হচ্ছে বিলের আকার। প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে পরিবেশের উপর। বিশেষ করে ১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ এর বন্যায় জেলার কৃষি জমির উপর বালুর পুরু স্তর পরে ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

আর্সেনিক : বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে এর (২০০১) এক জরীপে দেখা গেছে গোপালগঞ্জ জেলায় ৭৯% নলকূপে প্রতি লিটার পানিতে ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের বেশি আর্সেনিক রয়েছে।

নদী ভাঙন : এই জেলার প্রধান নদী মধুমতি ও লোয়ার কুমার বা মাদারীপুর বিল রুটের তীরে ভাঙন রয়েছে। বিশেষ করে মধুমতি নদীর তীরে ভাটিয়াপাড়া ও মোল্লা হাট এলাকায় নদী তীরবর্তী এলাকা ভাঙছে। এ ছাড়া বিল রুটে বিশেষ করে টেকেরহাট বন্দরটি প্রায় বিলীন হওয়ার পথে।

বিপদাপন্নতা

সীমিত সম্পদ বা জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থের অভাব ইত্যাদি প্রধান কয়টি জীবিকা দলের আর্থ-সামাজিক বিদাপন্নতার কারণ। গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে তাদের কাজের অভাব, মজুরি শোষণ, ভগ্ন বা রুগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পানি ও পয়: সুবিধার অভাব, আয়ের উৎস কমে যাওয়া ইত্যাদি। বসবাসের জায়গার অভাবসহ কাজের অভাব, জলাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শহরের দিন মজুর বা শ্রমিকদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

গোপালগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যা ১১.৫২ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৫.৭৯ লাখ এবং মহিলা ৫.৭২ লাখ। মোট জনসংখ্যার ৯১% গ্রামে বসবাস করে এবং ৯% শহরে বসবাস করে। এই জেলায় প্রতি বর্গ কি. মিটারে ৭৭৩ জন লোক বাস করে। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মিটারে ৮৩৯ জন লোক বসবাস করে এবং উপকূলীয় এলাকায় ৭৪৩ জন লোক বসবাস করে (বি.বি.এস., ২০০৩) ।

মোট জনসংখ্যা	১১.৫২ লাখ
পুরুষ	৫.৭৯ লাখ
নারী	৫.৭২ লাখ
শহুরে জনসংখ্যা	০.১১ লাখ
পুরুষ	০.০৫ লাখ
নারী	০.০৫ লাখ
জনসংখার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	৭৭৩
মোট পরিবারের সংখ্যা	২.১৭ লাখ
শহরে	০.০২ লাখ
গ্রামীণ	১.৯৭ লাখ
পরিবার প্রতি গড় জনসংখ্যা	৫.৩
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৬০
নারী প্রধান গৃহ (গ্রামীণ পরিবারের %)	২.৬

জেলায় ০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতা অনুপাত ০.৯৬।

ঘর-গৃহস্থালি : জেলায় গৃহস্থালির ধরনে ভিন্নতা আছে। শহুরে (২০,৩৪০) ও গ্রামীণ (১৯৭,১০০) মিলিয়ে গোপালগঞ্জে মোট পরিবারের সংখ্যা ২১৭,৪৪০টি। প্রতিটি পরিবারের জনসংখ্যা গড়ে ৫.৩ জন। (বি.বি.এস., ২০০১)

১৯৯১ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যে, জেলার মোট ঘরের ছাদের মধ্যে ৩৭% ছোন, বাঁশ, পাটকাঠী ও পলিথিন দিয়ে তৈরি ও ৬৯% ঢেউটিন বা টালীর তৈরি এবং ১% সিমেন্টের ছাদ। আবার এই সব ঘরের মধ্যে ৭১% পাটকাঠী ও বাঁশের বেড়া, ১% মাটি ও দেশীয় ইটের এবং ২৪% টিনের বেড়া, ৩% ঘরের বেড়া কাঠের এবং ২% ঘরের দেয়াল পাকা।

ঘরের ছাদ	%
ছোন, বাঁশ, পাটকাঠী পলিথিন	৩৭
ঢেউটিন/টালীর	৬৯
সিমেন্টের ছাদ	১
ঘরের দেয়াল	
পাটকাঠীর, বাঁশের তৈরি	৭১
মাটি ও দেশীয় ইট	১
টিনের	২৪
কাঠের	৩
পাকা দেয়াল	২

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলায় পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই। জেলায় ৩টি হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫টি, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১টি, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৫০টি, মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র ১টি, টিবি ক্লিনিক ১টি, শিশু হাসপাতাল ১টি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ১টি, পরিবার পরিকল্পনা সেবা কেন্দ্র ১টি ও ১টি চক্ষু হাসপাতাল আছে (সূত্র : সংকলন গোপালগঞ্জ জেলা শাখা)। এ ছাড়া দুটি বেসরকারি হাসপাতাল (ক্লিনিক) রয়েছে। জেলার সরকারি হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ২০০টি। ৫,৭৭৭ জন লোকের জন্য একটি শয্যা রয়েছে।

শিশু স্বাস্থ্য : এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬০ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৬ (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ ২০০১)। জেলায় ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ১০% অপুষ্টির শিকার। এই পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে হাম, ডিপিটি, পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৭৭%, ৫৭%, ৮৯% শিশু। এ ছাড়া ৪৯% শিশু ORT নিয়েছে (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ ২০০১)। জেলার ৭৩% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আছে। জেলার জণগণের মধ্যে প্রধানত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেপটিক আলসার আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : জেলার ৪৪% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৪৭% ঘরে কাঁচা পায়খানা আছে এবং ৯% ঘরে কোন রকম পায়খানা নেই। শহরে ৬৫% পাকা, ২৬% কাঁচা লেট্রিন ব্যবহার করে, ৮% কোন লেট্রিন ব্যবহার করে না। গ্রাম এলাকায় ৪২% পাকা, ৪৯% কাঁচা লেট্রিন ব্যবহার করে, ৯% কোন প্রকার লেট্রিনই ব্যবহার করে না।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৯৩% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে, বাকি ৬% অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। গোপালগঞ্জ জেলার বেশিরভাগ নলকূপের পানিতে আর্সেনিক রয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় ৭৯% নলকূপে প্রতি লিটার পানিতে ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক রয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি।

শিক্ষা

জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। সার্বিক সাক্ষরতার হার প্রায় ৫১%। পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫১% এবং নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪৯%। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫৫% (বি.বি.এস., ২০০৩)।

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর)	৫১%
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৯৩%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৪৪%
শয্যা প্রতি জনসংখ্যা	৫,৭৭৭ জন

জনগণের শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এই জেলায় বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - ১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নির্মাণাধীন), ৫টি সরকারি কলেজ (১টি মহিলা কলেজ), ১৭টি বেসরকারি কলেজ, ১টি ল' কলেজ, ১টি হোমিও, ১টি বি.এড., ১টি বি.পি.এড, ১টি পলিটেকনিক (নির্মাণাধীন), ১টি পিটিআই (বেসরকারি), ১টি ভি.টি.আই, ১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল (নির্মাণাধীন), ১টি দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি, ১৪২টি বেসরকারি, ৩৫টি নিম্ন মাধ্যমিক, ৫১৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২৩৯টি বেসরকারি প্রা. বি., ২টি আলিয়া মাদ্রাসা, ৪টি ফাজিল মাদ্রাসা, ২৪টি দাখিল মাদ্রাসা, ৫০টি কাওমী মাদ্রাসা, ১টি দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি কারিগরি বিদ্যালয় (বেসরকারি), ৪৮টি স্যাটেলাইট স্কুল, ১২টি কমিউনিটি স্কুল, ১৫০টি মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্র, ৪টি পাবলিক লাইব্রেরি, ৮টি পাঠাগার, ৪টি মডেল লাইব্রেরি, ২২০টি মসজিদ ও পাঠাগার ।

সামাজিক উন্নয়ন

গোপালগঞ্জ জেলা সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানির প্রাপ্তি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, শিক্ষার হার রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিকভাবে এগিয়ে আছে তবুও সামগ্রিক উন্নয়নে এগোতে পারেনি। এ কারণে দেখা যায় এই জেলায় জনগণের মাথাপিছু আয় (১৩,৪৫৭ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) এবং উপকূলীয় আয়ের (১৮,১৯৮) চেয়ে অনেক কম।

প্রধান জীবিকা দল

জনসংখ্যার বিরাট অংশই কৃষিজীবী। জেলার গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ৭৫% পরিবার কৃষির সাথে সংযুক্ত। এর পরেই রয়েছে মৎস্য চাষ, জেলে ও দিন মজুর। জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ তাদের জীবিকার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কৃষকদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, জেলার কৃষি শ্রমিক ও জেলেরা খুবই দরিদ্র।

গোপালগঞ্জের বিশাল জলাভূমি বিল, খাল ও নদীতে এক সময় ছিল দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক মৎস্য ভাণ্ডার। কিন্তু বর্তমানে এই জেলায় বিভিন্ন কারণে মাছের পরিমাণ খুবই কমে যাওয়ায় বহু লোক তাদের পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমাবনতি, ভূমিহীনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চাষের জমি বিভাজন,

দারিদ্র্য মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। কেউ হচ্ছে প্রতিবেশী জেলার চিংড়ি শ্রমিক, কেউ হচ্ছে রাজমিস্ত্রীর জোগালী, কেউ শহরে গিয়ে যখন যে কাজ পায় সে কাজ করে।

জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক, শহুরে শ্রমিক ও মৎস্যজীবী। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের চাষাবাদ করে মানুষ সংসার চালায়, যেমন শাক সবজী, কলা, পান ইত্যাদি। এ ছাড়া জেলায় প্রচুর মৌসুমী জেলে রয়েছে। যারা বর্ষাকালে জলাভূমিতে মাছ ধরে।

কৃষক : গোপালগঞ্জ জেলায় গ্রামীণ কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১৩৭,৫০২। এদের মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১০১,৮৩৬ (৫৫.৫%); মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০-৭.৪৯ একর) পরিবার ৩২,৩৬২টি (১৭.৬%) এবং বড় কৃষক (৭.৫০$^{+}$ একর) পরিবারের সংখ্যা ৩,৩০৪টি (১.৮%) ।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে, আবার পরিবার বিভাজনের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকে। জেলার মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ৫৯,৩৩২টি যা মোট পরিবারের ৩২%।

শহুরে শ্রমিক : বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত গোপালগঞ্জ শহরেও শ্রমিক সংখ্যা বেড়েই চলছে। গ্রাম এলাকায় যথাযথ আয়ের উৎসের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীন মানুষ শহরে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এরা কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, পরিবহন শ্রমিক, যোগালী হিসাবে কাজ করে। সক্রিয় জনশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ উপকূলীয় গড়ের চেয়ে বেশি। এদের মধ্যে অনেকেই গার্মেন্টস ও বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করে।

জেলে : জেলায় জেলেদের সংখ্যাও অনেক, এরা সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রমের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে থাকে। গ্রীষ্ম আসার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক মাছ ধরে। এরা বছরের মে থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত জলাশয়ে মাছ ধরে। আবার অনেক পরিবার নদী-নালা, খালে সারা বছর মাছ ধরে। জেলার ২,০০০টি পরিবার মাছ ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট। জেলার গ্রামীণ পরিবারগুলোর মধ্যে ১% পরিবার মাছ ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট।

চিংড়ি চাষী : জেলায় চিংড়ি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আশপাশের জেলায় চিংড়ি চাষীদের সফলতা দেখে বর্তমানে বহু কৃষকই তাদের চাষের জমিকে চিংড়ি ঘেরে রূপান্তরিত করছে। গোপালগঞ্জ জেলায় ১৯৯৭ সালে ১৩৯ হে. জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয় এবং ১২ মে. ট. উৎপাদিত হয়। পরবর্তীতে ২০০২ সালে জমির পরিমাণ বেড়ে ১৪২ হে. হয় এবং ১৭ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়।

কামার : গোপালগঞ্জে এই পেশার সাথে অতীতে অনেক পরিবার জড়িত ছিল, এখনও রয়েছে। কীর্তিপাশা, নবগ্রাম, বাউকাঠি, বাঘড়ী, গালুয়া, কাঁঠালিয়া, হযরতপুর, শৌলজালিয়া, কুমারখালি ও কুশাংগল এলাকায় এরা রয়েছে। হাট বাজারে লোহা দিয়ে এরা সাংসারিক ও কৃষি কাজে ব্যবহৃত দা, বটি, কোদাল, সাবল, খন্তা, কুড়াল, কাঁচিসহ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে।

কুমার/পাল : এরা মূলত পালবংশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। পরিবারের প্রয়োজনীয় থালা, বাসন, হাড়ি, পাতিল, কলস তৈরি করে। তবে এই কাজের সাথে এর দেবীমূর্তি, বিভিন্ন ধরনের মাটির পুতুল তৈরি করে বিভিন্ন মেলা বা

উৎসবে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। মাটির তৈজসপত্রের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে প্লাষ্টিক ও এ্যালমুনিয়ামের সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে এ শিল্পের জেলা জুড়ে ব্যবসা ছিল। এই পেশার সাথে বহু পরিবার জড়িত ছিল। এখনও জেলার বিভিন্ন এলাকায় এরা রয়েছে। তবে বড় ধরনের হাড়ি, টালি, কোড়া, মাটির কলস ও চাড়ি তৈরির মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রয়েছে। গ্রাম এলাকায় বিশেষ করে গরীব শ্রেণীর লোকজন এখনও মাটির তৈজসপত্র ব্যবহার করছে।

শাঁখারী : গোপালগঞ্জে শঙ্খ শিল্পের ঐতিহ্য ছিল। এ পেশায় জড়িত লোকদের শাঁখারী বলা হয়। এরা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহিত রমণীদের শাঁখা তৈরিসহ শঙ্খ কেটে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক জিনিসপত্র তৈরি করতো। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে এই শাঁখারীদের জীবনে দৈন্য আসায় অনেক শাঁখারী পরিবার এই পেশা ছেড়েছে। বর্তমানে শাঁখা তৈরির পাশাপাশি এরা শঙ্খ থেকে আংটি, গহনা তৈরি করে টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

কাঁসারী : এ অঞ্চলে কাঁসা, তামা ও পিতলের ব্যবহার পুরানো আমল থেকে চলে এসেছে। ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এর ব্যবহার ছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কাঁসা, পিতলের সামগ্রীর ব্যবহারে আগ্রহ রয়েছে। ১৫/২০ বছর পূর্বে এ অঞ্চলে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিনের মত আচার অনুষ্ঠানে প্রিয়জনদের কাঁসা, পিতলের তৈরি সামগ্রী উপহার দেয়া হতো। এখনও এ জেলায় এই সকল অনুষ্ঠানে পিতলের কলস মর্যাদাসম্পন্ন উপহার হিসেবে গণ্য করা হয়।

গোপালগঞ্জ জেলায় পেশাভিত্তিক আরো কিছু সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে বয়াতী, কাঠমিস্ত্রী/রাজমিস্ত্রী, হকার, ঋষি, মাঝি, ওঝা, কবিরাজ ও বাজনাদার।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মাথাপিছু আয়	১৩,৪৫৭ টাকা
মোট আয়ে শিল্প খাতের ভাগ	১৬%
স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৪.৯%
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন খানা	১৩%

জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ এই সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সক্রিয় শ্রম জনশক্তির সংখ্যা ৫৮০ হাজার। এর মধ্যে ৫৮% পুরুষ এবং ৪২% নারী। ১৯৯৫-৯৬ সালে জনশক্তি ছিল ৪৯১ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ৬৬%, ৩৪% (বি.বি.এস., ২০০০)। বর্তমানে জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৩,৪৫৭ টাকা। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৯ হেক্টর।

দারিদ্র্য

দরিদ্র	৪৩%
অতি দরিদ্র	২১%
ভূমিহীন	৩৮%
ক্ষুদ্র কৃষক	৫৫%

এই জেলায় অধিকাংশ লোক কৃষি নির্ভর। আর প্রধান ফসল হচ্ছে ধান। এ ছাড়াও রয়েছে কলা, পান, সবজি, ইক্ষু ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রকৃতি নির্ভর তাই যখনই কোন দুর্যোগ আসে তখন এই সব ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকরা পরে দূরবস্থায়। আর এই ক্ষতির পরিমাণ ২-৩ বছরেও কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে বহু কৃষক দিন দিন দারিদ্র্যের মধ্যে চলে যায়। এ ছাড়াও নদী ভাঙনের ফলেও ধীরে ধীরে বহু পরিবার নীরবে দারিদ্র্যে সীমার মধ্যে প্রবেশ করছে।

গোপালগঞ্জ জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৩% দরিদ্র এবং ২১% অতি দরিদ্র (বি.বি.এস./ইউনিসেফ)। এ ছাড়া জেলার মোট ৩৮% গ্রামীণ কৃষক ভূমিহীন এবং ৫৫% ক্ষুদ্র কৃষক।

নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গোপালগঞ্জ জেলার নারীদের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। সম্প্রতি সিপিডি-ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় গোপালগঞ্জ জেলা "মধ্যম মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য-এই সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক বন্ধন, শিক্ষা নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন বয়ে আনছে। নারীদের অবস্থানকে তথাকথিত কঠোর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে উন্নয়নের অংশীদার করে নেয়ার সময় এসেছে।

লিঙ্গ অনুপাত : গোপালগঞ্জের মোট জনসংখ্যার ৪৯.৭% নারী। জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০১। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের (০-১৪ বছর) মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৭। আবার প্রজননক্ষম বয়সদলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯২ (বি.বি.এস., ২০০১)।

প্রজনন স্বাস্থ্য : পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৫২, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। গোপালগঞ্জের নারীরা তাদের জীবদ্দশায় গড়ে ২.৩৫ টি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন । জেলার ৩৯% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

বৈবাহিক অবস্থা : জেলায় ৩০% নারী বিবাহিত এবং ৪.২৯% নারী তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৩% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের ওপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিও-দের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

- **জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০১**
- **নারীদের মধ্যে সার্বিক (৭^{+}) ও প্রাপ্ত বয়স্ক (১৫^{+}) সাক্ষরতার হার, ৪৭% এবং ৪৯%, জাতীয় (৪১) হারের তুলনায় বেশি।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার (৮১%) জাতীয় হারের তুলনায় কম।**
- **জেলায় সক্রিয় জনশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ (৪২%) জাতীয় হারের (৩৭%) চেয়ে বেশি।**
- **মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি।**
- **জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৯%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।**
- **মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪ জন, যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম।**

সক্রিয় শ্রমশক্তি : গোপালগঞ্জ নারীদের মধ্যে সক্রিয় শ্রমশক্তির হার ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে সক্রিয় শ্রমশক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনশক্তির ৩৪% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪২%, যারা সকলেই গ্রামের। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক চিরায়ত পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২.৪৮% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয় (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ২৭% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : গোপালগঞ্জের নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা নারীর স্বাস্থ্যদশাকে সার্বিকভাবে দুর্বল করেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ১২%, যা জাতীয় হারের তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৭% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ৮৯% ক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন। মাত্র ৭% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান এবং আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৪% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শিক্ষা : জেলার মেয়েদের সার্বিক সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৭% এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪৯%। প্রাথমিক স্কুলে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী মেয়ে শিশুদের ভর্তির হার ৮১% এবং প্রাথমিক স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪৯% মেয়ে শিশু। একই চিত্র দেখা যায় মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫৩% ছাত্রী এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫৯% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। মাত্র ৩১% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতিপরিচিত ঘটনা।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

গোপালগঞ্জ জেলায় ১,৫০৩ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ৮৮ কি.মি. জাতীয় মহা সড়ক, ৫৮ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক, ৩৫৮ কি.মি. ফিডার রোড এ, ১১৫ কি.মি. ফিডার রোড বি এবং ৫০৫ কি.মি. গ্রামীণ -১, ও ৩৮৫ কি.মি. গ্রামীণ - ২ ধরনের রাস্তা রয়েছে। জেলায় প্রতি বর্গ কি.মিটারে ১ কি.মিটার রাস্তা রয়েছে। যদিও এই হার উপকূলীয় অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু রাস্তাঘাটের অবস্থা বেশি ভাল নয়। ফলে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা কঠিন হচ্ছে। তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাটেরও উন্নয়ন প্রয়োজন।

পাকা রাস্তা	১,৫০৩কি.মি.
সওজ রাস্তা	৪৯৮ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	১,০০৫ কি.মি
রাস্তার ঘনত্ব	১.০১ কি.মি./ বর্গ কি.মি.

নৌ-পথ

এই জেলায় ১৪৫ কি.মি. নদী রয়েছে। যেখানে জোয়ার-ভাটা হয় এবং নৌ-চলাচল করে, যা একদিকে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা আবার পরিবহন ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খুবই জরুরি।

পোল্ডার বা বাঁধ

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভরা জোয়ারের বন্যা থেকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে বাংলাদেশে পোল্ডার বা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেশ কয়েকটি পোল্ডার রয়েছে। এই সব পোল্ডারের আওতায় ২৬০.৬০ কি.মি. বাঁধ, ৪৮টি রেগুলেটর ২৩৭টি ফ্লাস ইনলেট, ৬৮৯ কি.মি. নিষ্কাশন খাল রয়েছে।

পোল্ডার/বাঁধ	
উপকৃত এলাকা	৯৭৪৬৮ হে.
বাঁধ	২৬০.৬০ কি.মি.
রেগুলেটর	৪৮ টি
ফ্লাস ইনলেট	২৩৭ টি
নিষ্কাশন খাল	৬৮৯ কি.মি.
ব্রীজ	১২টি

এ সব বাঁধ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করা প্রয়োজন। এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতার অভাব এবং বাঁধ দুর্বল হওয়ার ফলে অনেক সময় ভেঙ্গে যায়। বিশেষ করে বন্যার সময় পানি প্রবেশ করে ফসলসহ অন্যান্য সম্পদ নষ্ট হয়।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা ভোগ্যপণ্য বিস্তারের কারণে জেলায় হাটবাজার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জেলায় ১৪৯টি হাটবাজার ও ২৫টি মেলা রয়েছে। জেলার বেশিরভাগ পণ্য পরিবহন হয় নৌপথে। অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে নদীপথই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচলের জন্য জেলায় বেশ কয়েকটি নদী বন্দর গড়ে উঠেছে। এই বন্দরগুলোতে আভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলাচল করা বড় লঞ্চ, ছোট লঞ্চ এবং যন্ত্রচালিত নৌকায় লোক এবং মালামাল উঠানামা করে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, এই বন্দরগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বড় হাটবাজার ও মোকাম। এসব বন্দরের সুযোগ সুবিধা আরো বাড়লে জেলা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই জেলায় বাসস্ট্যান্ড রয়েছে এবং প্রতিদিন দূরপাল্লার বাস চলাচল করে।

বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ

জেলায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ২৭,২০০টি পরিবারকে বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছে। এর মধ্যে ১০,৫০০ পরিবারকে শহরে এবং পল্লীতে ১৬,৭০০ পরিবারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীনে ১,৬৭৬ কি.মি. বিদ্যুৎ লাইনের মাধ্যমে ২৯৬টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে।

এ জেলার সব উপজেলার সাথেই ঢাকা বা অন্যান্য জায়গার আধুনিক টেলিফোনের যোগাযোগ রয়েছে।

উপাসনালয়

ধর্মীয় উপাসনালয়ের মধ্যে ২,০৭৫টি মসজিদ, ২৪৭টি মন্দির এবং ১৩টি গীর্জা আছে (সূত্র : সংকলন গোপালগঞ্জ জেলা শিশু একাডেমি) ।

হোটেল/অবকাশ কেন্দ্র

জেলা সদরে একটি সার্কিট হাউজ ও একটি ডাকবাংলো রয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডাকবাংলো রয়েছে। এছাড়া পর্যটনের একটি মোটেল আছে।

শিল্পাঞ্চল

জেলায় ১টি জুট মিল, ১০টি বরফ কল এবং ১০৫টি ধান/আটা ভাঙ্গা কল। এ ছাড়া বেশ কিছু তাঁত রয়েছে।

সেচ ও গুদাম

জেলার কৃষিজীবীরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী দুই ধরনেরই প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এল.এল.পি. দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয় এবং পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে চাষ দেয়া হয়। এই জেলায় ২,৫৫২টি এলএলপি, ৩,০০৪টি শ্যালো নলকূপ এবং ৬টি গভীর নলকূপ দিয়ে মোট ৪৪,২৯৬ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয়। জেলায় ২০টি খাদ্য গুদাম রয়েছে এই গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা মোট ১৩,২৫০ মে.টন। ৬টি বীজ গুদাম রয়েছে, যার ধারণ ক্ষমতা ৬৫০ মে.টন এবং ১টি সার গুদাম (ধারণ ক্ষমতা ১,৫০০ মে.টন) রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে গোপালগঞ্জ জেলায় সরকারি ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি উন্নয়ন অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্প সংখ্যা
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
মৎস্য অধিদপ্তর	২
কৃষি উন্নয়ন অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	২
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড	৩
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	১

এসব প্রকল্পে যে সব উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহযোগিতা করছে সেগুলো হচ্ছে জেবিআইসি (JBIC), ডিএফআইডি (DFID), ডব্লুএফসি (WFC), ডানিডা, আইডিবি (IDB), নোরাড, ইউনিসেফ, ইত্যাদি।

এই জেলায় বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক NGO কাজ করেছে। যেমন CIDA, Prip Trust ও CARE ইত্যাদি। স্থানীয় বেশ কিছু এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে।

জেলায় কর্মরত জাতীয় NGO গুলোর মধ্যে BRAC, PROSIKA, CARITAS ও ASA উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, দেশীয় এনজিওগুলো জেলার ৩২% পরিবারের মধ্যে ৬১,৬৫০টি লোন দিয়েছে। প্রতিটি লোন ৭,৪৭৫ টাকা করে মোট ৩,৭৩২ টাকা বিলি করা হয়েছে।

Problems grip Gopalganj municipality

OUR CORRESPONDENT, *Gopalganj*

municipality were absent. Absenc
of proper drainage system deplor

বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করে দিন কাটছে গোপালগঞ্জ পৌরবাসীর

Muksudpur Poura people bereft of basic facilities

From Our Correspondent

GOPALGANJ, June 2:—The authority of Muksudpur Pourasava of Gopalganj district has failed to provide the dwellers with minimum basic civic amenities, it is alleged.

The deplorable condition of roads, absence of proper drainage system, frequent power failure, unauthorized shops and inadequate road lights are causing sufferings to the Muksudpur poura dwellers.

urinals the Poura area and people respond to the call of nature in the road side drains polluting the environment.

Due to lack of proper supervision the unhygienic condition of hotels and restaurants in the town have been chasing health hazard. Adulterated foodstuff are freely sold in open places the town. Absence of recreation of town dwellers especially the youths who spend their leisure time in scouring at different tea

NGO survey report reveals

95 pc water of tubewells contaminated in Gopalganj

From Our Correspondent

GOPALGANJ, Oct 30:–Arsenic From about 48,976 families
ntamination of ground water is total of 3,18,448 members wa
arming in
ith about 10
far.
At lenst 6 pe
others are
senic water
strict in five
uls said.
On Sunday
ganisation
iyan Proche
ed 40 arse
oxes among
utikelbari of
r Gopalgan

সাদুল্যাপুর ও নান্দাইলে ডায়রিয়ায় মারা গেছেন ৫ জন

নিউমোনিয়ায় গোপালগঞ্জে ৩৮ দিনে ৩২ শিশুর মৃত্যু

নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার কোটালীপাড়ায় দেবে গেছে নির্মাণাধীন স্লুইসগেট

Embankment damaged at 35 points in Gopalganj

From Our Correspondent

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

গোপালগঞ্জ জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং মানুষের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এইসব সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

পরিবেশগত সমস্যা

জলাবদ্ধতা : এই জেলায় গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট খালগুলোর মুখ পলি পরে জমির চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে, যার ফলে ভরা জোয়ারে পানি উঠে পড়লে আর নামতে পারে না। আবার অতি বৃষ্টির সময়ও জমিতে পানি জমে ফসলের ক্ষতি হয়। এ ছাড়া গ্রামে অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ করার ফলেও জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

জীব বৈচিত্র্য হ্রাস : এই জেলার কিছু মাছ ছিল, যা মিঠা এবং লবণ পানি উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায় যেমন তাপসী, পোয়া, গুলসা ট্যাংরা, চাপিলা ইত্যাদি। এ সব মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে। অনেক মিঠা পানির মাছ যেমন সরপুটি, পাবদা, বাইলা, ফলি ইত্যাদি দিনে দিনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও অনেক প্রাণী যেমন বাগডাস, উদবিড়াল, শিয়াল, মেছো বিড়াল ইত্যাদি এখন আর তেমন দেখা যায় না।

পরিবেশ দূষণ : জেলার শিল্প কারখানা ও শহরের বর্জ্য স্থানীয় পরিবেশকে দূষিত করছে। এই জেলা শহরের নদীর তীরে বেশ কিছু লবণ কারখানা, এ্যলুমিনিয়াম, কাঁশা, পিতলের কারখানা রয়েছে। এ সকল কারখানা থেকে সৃষ্ট বর্জ্য নদীতে ফেলা হয়। একই সাথে শহরের বর্জ্য পদার্থও নদীর পানিতে মিশে যাচ্ছে। ফলে নদীর পানি এবং স্থানীয় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বিশেষ করে ফসল এবং ফসলের জমিতে এই পানি খুবই ক্ষতি করছে।

পরিবেশগত সমস্যা
- জলাবদ্ধতা
- জীব বৈচিত্র্য হ্রাস
- পরিবেশ দূষণ
- বন্যা
- কালবৈশাখী/ঘূর্ণিঝড়
- আর্সেনিক
- নদী ভাঙন

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- কৃষি বিষয়ক সমস্যা
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

শিল্প বিষয়ক সমস্যা
- কুটির শিল্পের বিলুপ্তি
- তাঁত শিল্পের সমস্যা

বন্যা : গোপালগঞ্জ জেলায় কয়েক বছর পর পরই বন্যা দেখা যায়। ফলে জনগণের জানমাল, অবকাঠামো, স্থানীয় সম্পদ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি জেলার উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়।

কালবৈশাখী / ঘূর্ণিঝড় : প্রায় প্রতি বছর গ্রীষ্মেই কালবৈশাখীর আঘাতে জেলার কোন না কোন এলাকা বিপর্যস্ত হয়। এ ছাড়া মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড়ও আঘাত হানে।

আর্সেনিক : বাংলাদেশের আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলোর মধ্যে গোপালগঞ্জ অন্যতম। মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের ফলে চর্মরোগসহ বিভিন্ন প্রকার রোগের উপদ্রব দেখা যায়।

নদী ভাঙন : বিভিন্ন নদীতে ভাঙন জেলার একটি বড় সমস্যা।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

কৃষি বিষয়ক সমস্যা : জেলার কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা সনাতনী পদ্ধতির। এই জেলার কৃষি ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পঙ্গপালের (পামুরী) আক্রমণ ও দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও জ্ঞানের অভাব।

আউস ও বোরো ধানে প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন রকমের পোকার আক্রমন হয়ে থাকে। এই পোকা মাকর ফসল ধ্বংস করে ফেলে। জেলার ফসল রক্ষাকারী বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। ফলে একটু বন্যা হলেই কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগাম বর্ষনের ফলেও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়া বাঁধের মধ্যে পানি সংরক্ষণের অভাবে কৃষি কার্য ব্যাহত হয়। জেলার কৃষকরা উন্নত জাতের বীজ সহ বিভিন্ন আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব অনুভব করে থাকে।

জেলায় বেশ কিছু অর্থকরী ফসল, যেমন কলা, আমড়া, নারিকেল, সুপারি ও পানের বাগান আছে। এ সব বাগান থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ ফল ও কৃষি পন্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু এ সব পণ্য বাজারজাতকরণ এবং সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা জেলায় নেই। এ ছাড়া মধ্যসত্বভূগীদের কারণে কৃষকরা ফসলের প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ছাড়া পেয়ারা, আমড়া, কলা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু কৃষকদের রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে তারা ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : জেলায় প্রচুর জলাভূমি ও খাল-বিল থাকার কারণে অনেক এলাকায় নৌ-পথই চলাচল ও পণ্য পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম। ফলে অনেক এলাকায় স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। বছরের বেশির ভাগ সময় কৃষকরা বা গ্রামের লোকজন চলাচলের জন্য নৌকা ব্যবহার করে। ফলে কৃষিপণ্য বাজারজাত করা খুবই কঠিন হয়ে পরে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে, বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। সেই সাথে জেলার একটা বিরাট অংশে নৌ-পথেও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।

শিল্প বিষয়ক সমস্যা

ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ মিলিয়ে এই জেলায় শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। কারণ এই জেলা নিচু এলাকা খাল-বিল ও জলাশয় দিয়ে ঘেরা।

কুটির শিল্পের বিলুপ্তি : গোপালগঞ্জ এক সময় এ এলাকার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সেই কারণেই এখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প। যেমন তাঁত, মৃৎ শিল্প, স্বর্ণকার, কাশারু, শাঁখা ও বিড়ি ইত্যাদি। বর্তমানে এ সব শিল্প কারখানার খুবই দুরবস্থা এবং অনেক কারখানা নেই বললেই চলে। একদিকে আধুনিকায়ন অন্যদিকে বড় শহরভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ার প্রবণতা, ফলে এ সব শিল্প কারখানার শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ছে এবং তারা অর্থের অভাব ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে পেশা পরিবর্তন করছে।

তাঁত শিল্পের সমস্যা : এক সময় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, রাধাগঞ্জ, শিতাইকুণ্ড ও কাশিয়ানী মিলে ৪-৫ হাজার পরিবার ছিল। বিশেষ করে ফরিদপুরের শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা গোপালগঞ্জেই তৈরি হত, সময়ের সাথে সাথে এবং যান্ত্রিক যুগের আগমণে এই শিল্প প্রচন্ড দুরবস্থায় পড়েছে। যুগের সাথে বা আধুনিক শিল্পের সাথে তাল মিলাতে না পারায় তাতিরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে পেশা পরিবর্তন করছে। এখনও জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই শিল্প। বর্তমানে এই জেলায় প্রায় ৫০০ পরিবার রয়েছে যারা শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা তৈরি করে।

Fortune from papaya

Phul Mia earns Tk 9,000 each day sending papaya to Dhaka, Barisal and other dists

ALIMUZZAMAN MIA, *Gopalganj*

Once jobless Phul Mia, 45, is now a self-reliant farmer. He earns Tk 9,000

for papaya cultivation. expanded his farm on land. He employed seve his farm, situated at Tungipara upazila. Rec

কোটালিপাড়ায় পশুপাখি পালন প্রসঙ্গে

Anti-dowry meeting held in Gopalganj

OUR CORRESPONDENT, *Gopalganj*

An anti-dowry meeting was held at Sheikh Fazlul Haque Moni Primary School at Gobra village in Sadar upazila on Monday.

A non-governmental organisation (NGO), CCDB, Gopalganj organised the meeting.

CCDB project manager George Ashit Sengha presided over the meeting while Gopalganj deputy commissioner (DC) Mohammad Abdur Rouf was present as chief guest and Sadar upazila nirbahi officer (UNO) Mohammad Giashaddin Moghol was special guest.

Arsenic: Water purifiers supplied by NGO in Gopalganj

Water of 13,465 tube-wells arsenic contamin

Arsenic has created panic in three upazilas of Gopalganj district.

Arsenic has been detected in water of 13,465 out of 15,207 tube-wells in Muksudpur, Kasiani and Gopalganj Sadar upazilas.

সম্ভাবনা ও সুযোগ

কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা ও শিক্ষার বিপুল সম্ভাবনাময় জেলা গোপালগঞ্জ। জেলা ও মাঠ পর্যায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে আলাপ-আলাচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, মৎস্য সম্পদ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গোপালগঞ্জের পুরান ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প সংরক্ষণ করা গেলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

কৃষি ও অর্থনীতি

গোপালগঞ্জ জেলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং উন্নতমানের স্থানীয় ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ সরবরাহ করে কৃষির উন্নয়নের সম্ভবনা রয়েছে। একই সাথে ফসল সংরক্ষণের সুব্যবস্থা এবং প্রকৃত মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

কৃষি ও অর্থনীতি
কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প
মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা
অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন
শিল্পাঞ্চল
উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
ব্যক্তিখাত
খনিজ সম্পদ ব্যবহার
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ

এ জেলার সব উপজেলাগুলোতেই প্রচুর রবি শস্য যেমন বিভিন্ন রকমের ডাল, তেলবীজ, বাদাম, পেঁপে, কলা, আলু, শাক-সবজি, মরিচ ইত্যাদির চাষ হয়। এ সকল ফসলের সংরক্ষণ করে কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প : এখানে কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। যেমন নারিকেলের ছোবরা দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক অনেক জিনিষপত্র তৈরি হয়।

শীতকালীন শাক-সবজি সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের আধুনিক ব্যবস্থা এ শিল্পের বিকাশে সহায়তা করবে। এ ছাড়াও কাঠ শিল্প, মৃৎশিল্প, কামার, কাশারী, কুমার, চুনারী এসবের বেশ সম্ভাবনা রয়েছে।

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা : দুই দশক পূর্বেও গোপালগঞ্জ জেলা ছিল বাংলাদেশের একটি অন্যতম মিঠা পানির মৎস্য ভাণ্ডার। এই জেলায় জলাশয়গুলোতে এখনও প্রচুর মাছ জন্মায়। প্রাকৃতিক কারণে জেলার জলাভূমি ও পুকুরে সারা বছর পানি থাকে। তাই জনগণ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো এগিয়ে আসলে এই জেলার খাল-বিল-পুকুরে মাছ উৎপাদনের একটা বড় সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও জেলার যে সব বিলগুলোতে একটি মাত্র ফসল (বোরো) চাষ হয়, ঐ সকল ভূমিতে ও মাছ চাষ করা সম্ভব। এ ছাড়াও জেলায় বহু স্থানে মধুমতি ও মধুমতির শাখা নদীর বাওড় রয়েছে ঐ সব স্থানেও মাছ চাষ সম্ভব।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন : এক সময় গোপালগঞ্জ ছিল বিশিষ্ট স্থান ও বাণিজ্য কেন্দ্র। বর্তমানেও বৃহত্তর ফরিদপুরের মধ্যে গোপালগঞ্জ প্রধান পাইকারী ব্যবসা কেন্দ্র। তাই এ জেলার সাথে আশপাশের জেলাগুলোর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন দরকার। জেলায় কৃষি, মৎস্য ও ফলজ পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ঐ সকল কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন গোডাউন, বিদ্যুত, জেটি এবং অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করলে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধান করা হলে এবং সহজে দেশের সব জায়গায় স্থানীয় পণ্য পৌছানো নিশ্চিত করতে পারলে এ জেলার বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পাইকারী ক্রেতাদের নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন।

শিল্পাঞ্চল : এই জেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ার জন্য সরকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পে জমি হুকুম দখলের কাজ এবং প্লট বরাদ্দের কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যেই ব্যক্তি উদ্যোগে জেলায় একটি পাটকল গড়ে উঠেছে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে অর্থনৈতিক দিক আরও সমৃদ্ধ হবে। বিশেষ করে রূপসা সেতু এবং মাওয়া সেতু হলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

ব্যক্তিখাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তি খাতে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প এবং বেশ কয়েকটি বরফকল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বহু বছর পূর্ব থেকে চাল ভাঙ্গার কল, স-মিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এ সব ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ আর্থিক সহযোগিতা করলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

খনিজ সম্পদ ব্যবহার

এই জেলার চান্দার বিল এবং বাঘিয়ার বিলে পিট কয়লার মজুত রয়েছে। এই কয়লার পরিমাণ প্রায় ১৫০ মিলিয়ন টন। এই কয়লার উত্তোলন এবং বাজারজাত করা গেলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ

জেলার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের গাছ পালা যেমন নলবন, হোগলা বন এবং বিভিন্ন রকমের গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা গেলে জেলার ফসল, সম্পদ, নদী-নালা ও ভূমি রক্ষা পাবে। গোপালগঞ্জ জেলায় বেশ কিছু জলাভূমি ও বিল রয়েছে। এই বিলগুলো বর্তমানে বিভিন্ন কারণে দখল বা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এই সব জলাশয় সংরক্ষণ করা হলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা করা যেতে পারে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

গোপালগঞ্জের বর্তমান জনসংখ্যা ১১.৫২ লাখ থেকে ২০১৫ সালে হতে পারে ১২.৮৯ লাখ এবং ২০৫০ সালে হতে পারে ১৬.৭৫ লাখ। মাত্র ১৫ বছরে লোকসংখ্যা বাড়তে পারে ১.৩৭ লাখ। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর।

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানা পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায় তা হল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা উন্নয়ন ইত্যাদি। অন্যদিকে যে সব বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া দরকার তা হল জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি ব্যবস্থাপনা, আপদকালীন নিরাপত্তা, বন্যা সতর্কীকরণ, নদী শাসন, জীব বৈচিত্র হ্রাস, জলাভূমি ভরাট, নগর ও শিল্প দূষণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

এই জেলার মূল ফসল ধান, পাট, আখ, চিনা বাদাম শীতকালীন শাক-সবজি। তাই কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে উঠলে জেলার উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

ভৌগোলিক কারণে এই জেলায় ভবিষ্যতে একটি বড় ধরনের মাছ চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেহেতু জেলায় বেশ কয়েকটি বড় বিল ও বাওর আছে এবং পুকুর, খাল-বিলে সারা বছরই পানি থাকে সেহেতু অতীতের ধারাবাহিতা ধরে এই জেলায় সমাজভিত্তিক মাছ চাষের একটি সম্ভাবনা আছে।

এ ছাড়াও জেলায় বাঘিয়ার বিল এবং চান্দার বিল এলাকার একটি বিরাট অংশে পিট কয়লা রয়েছে। তাই সঠিকভাবে অনুসন্ধান করে এই পিট কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহারের মাধ্যমে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

এ ছাড়া রূপসা সেতু এবং মাওয়া সেতুর সাথে এই জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশিষ্ট। কারণ এই জেলার উপর দিয়ে গেছে ঢাকা-খুলনা মোংলা, বেনাপোল জাতীয় সড়ক। এ ছাড়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির হার কমে যাবে।

এ ছাড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শিল্পাঞ্চল করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাপ্ত কাঁচামাল যেমন মাছ, পিট কয়লা, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে রাস্তা-ঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে উপজেলার প্রবাসী ব্যক্তিবর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব হতে পারে। বাস্তবসম্মত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এই উদ্যোগ অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

দর্শনীয় স্থান

গোপালগঞ্জ জেলা হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যশালী জনপদ। এখানে রয়েছে নানাবিধ দর্শনীয় স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী। নবম শতকের মাঝামঝি সময়ে জেলার কোটালীপাড়ায় ছিল এ জনপদের রাজধানী। কালের গর্ভে সে সব নিদর্শনাবলী হারিয়ে গেলেও এখানে বিভিন্ন জমিদার বাড়ি, প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা এ জনপদের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। এ ছাড়া আধুনিক বিভিন্ন স্থাপনাও জেলাকে পর্যটনের জন্য করেছে আকর্ষনীয়। জেলার বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও আকর্ষনীয় স্থানের বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো।

একাত্তরের বধ্যভূমি : বাংলাদেশে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী গোপালগঞ্জের তৎকালীন সি.ও অফিসে তাদের ঘাটি স্থাপন করে। তখন এটি ক্যান্টনমেন্ট নামে পরিচিত ছিল। গোপালগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলা থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও জনসাধারণকে ধরে এনে হানাদার বাহিনী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন পুকুরের পাশে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে গুলি করে হত্যা করত। এ পুকুরটি বাংলা পুকুর নামে পরিচিত। বাংলা পুকুরের আশপাশে মহান মুক্তিযুদ্ধের অনেক জানা অজানা শহীদদের গণকবর রয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুকুরটি ভরাট করে এখানে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার : টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার কমপ্লেক্স জেলার প্রধান দর্শনীয় স্থান। আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এ কমপ্লেক্সে রয়েছে সুবিশাল আঙিনা, মসজিদ, লাইব্রেরি, প্রদর্শনী কেন্দ্র, ৪০০ আসনের উন্মুক্ত মঞ্চ, স্যুভেনীর সপ, ক্যাফেটেরিয়া ও গাড়ী পার্কিং এর স্থান।

কোটালীপাড়া বহুতলী জামে মসজিদ : গোপালগঞ্জ জেলার প্রাচীনতম মসজিদ। মসজিদটি কোটালীপাড়া পিঞ্জরী ইউনিয়নের সিকদার বাড়িতে অবস্থিত। এটি অনুমানিক পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়। এতে তিনটি গম্বুজ রয়েছে এবং এর নির্মাণশৈলী খুবই আকর্ষণীয়। এটি প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্যকলার এক অনন্য নিদর্শন।

থানাপাড়া মসজিদ : গোপালগঞ্জ জেলা শহরের প্রথম মসজিদ থানা পাড়া মসজিদ। ১৯২০-২১ সালে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থানাপাড়া মসজিদ ছিল এ এলাকার মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র। গোপালগঞ্জ শহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম অঞ্চল থেকে শত শত মুসলমান কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মিছিল শেষে এই মসজিদ প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হতেন। অনুষ্ঠান শেষে মাটির গ্লাসে করে মাঠা ঘোল বা চিনির সরবত দিয়ে সমাবেশে আগত জনতাকে আপ্যায়ন করার একটা রেওয়াজ প্রচলিত ছিল।

ঘাঘর কান্দা জামে মসজিদ : গোপালগঞ্জ উপজেলার ঘাঘরকান্দা গ্রামে ঘাঘর নদীর পশ্চিম তীরে একটি প্রাকৃতিক মনমুগ্ধকর স্থানে এই মসজিদটি ১৯৪৮ সালে জনৈক আজিজ ব্যাপারীর উদ্যোগে নির্মিত হয়। মসজিদের উপরিভাগে একটি বড় গম্বুজ ও চারকোণায় ৪টি ছোট গম্বুজ রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মসজিদটি বর্তমানে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

খাঘাইল গায়েবী মসজিদ : গোপালগঞ্জের সদর উপজেলার খাঘাইল গ্রামে একটি পুরাতন পাকা মসজিদ রয়েছে। এটির নির্মাণের সন তারিখ জানা যায় না। স্থানীয় লোকজন মসজিদটিকে গায়েবী মসজিদ বলে অভিহিত করে থাকেন। মসজিদটির নির্মাণশৈলী দেখে অনুমান করা যায় এটি আনুমানিক ১৫০ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল।

কোট মসজিদ : গোপালগঞ্জ জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই কেন্দ্রীয় মসজিদটি ১৯৪৯ সালে নির্মিত হয়। মসজিদটিতে একটি সুদৃশ্য উচ্চ মিনার, বৃহৎ আকারে প্রবেশ গেটসহ একটি সুদৃশ্য বড় গম্বুজ ও দুটি ছোট গম্বুজ রয়েছে। এ মসজিদটি নির্মাণ স্থাপত্যশৈলী দৃষ্টি নন্দন।

জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা : দেশের অন্যতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসাটি ফরিদপুর, যশোর, খুলনা ও বরিশাল জেলার মিলন কেন্দ্র মধুমতি নদীর তীরে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলাস্থ গওহরডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ বহু গ্রন্থ প্রণেতা মোজাহিদে আজম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ:)। ১৩৫৬ হিজরী সনে মাদ্রাসাটি ক্ষুদ্র পরিসরে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এটি ১২ একর জমি জুড়ে ব্যাপৃত। মাদ্রাসাটি এ অঞ্চলে দীর্ঘ ষাট বছর ধরে দ্বীনি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে আসছে। মাদ্রাসা সংলগ্ন পশ্চিম পাশে সদর সাহেব হুজুর (রহ:) এর মাজার অবস্থিত।

সেন্ট মথুরানাথ এজি চার্চ : গোপালগঞ্জ জেলা শহরে থানাপাড়ায় ১৮৭৫ সালে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য এই চার্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা মথুরানাথ বোস। গোপালগঞ্জ শহরের প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে সেন্ট মথুরানাথ চার্চটি অন্যতম।

ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়ি : গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার অধীনে ওড়াকান্দি গ্রামে এই ঠাকুর বাড়ি অবস্থিত। এখানে প্রতিবছর চৈত্র মাসে ত্রয়োদশী তিথিতে বারণীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম মৃত্যু স্মরণে পুণ্য লাভ প্রত্যাশী হিন্দু সম্প্রদায় হরিচাঁদ ঠাকুর মন্দির সংলগ্ন 'কামনা সাগর' নামক পুকুরে পুণ্যস্নান করে হরিচাঁদ মন্দিরটি সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। এই মেলায় প্রতিবছর লাখ লাখ হিন্দু পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে আসে।

সিদ্ধান্ত বাড়ী "শিব মন্দির" : গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার সিদ্ধান্তবাড়ি নামক স্থানে শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত এই মন্দিরটি স্থানীয় লোকদের কাছে "বুড়া ঠাকুর" মন্দির নামে অধিক পরিচিত। প্রায় দু'শো বছর ধরে চৈত্র মাসের ২৯ তারিখে এখানে নিয়মিতভাবে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বসে।

ভেড়ার হাটের অপর পাড়ে আড়পাড়া গ্রামে প্রকৌশলী মুন্সী ইকরামুজ্জামান সৃজন করেছেন একটি মনোরম উদ্যান। ঘাট বাঁধানো মাঝারি সাইজের দীঘির পাড়ে আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর দালান কোঠা, পাকা রাস্তা, দীঘির অপর পাশে নয়নাভিরাম বৃক্ষরাজি, ক্যাকটাস এবং দেশী-বিদেশী সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। পাশেই মুন্সী বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন মসজিদের মিনার। বাগানের পাশ ঘেঁষে বয়ে চলেছে ছোট সুন্দর নদী বিলরুট ক্যানেল। সম্পতি এ নদীর উপরে নির্মিত হয়েছে বাগানের অদূরে হরিদাসপুর সেতু। স্পটটি ইতোমধ্যেই রুচিশীল এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শহুরে জীবনের যান্ত্রিক জটিলতা থেকে অনেকেই হাফ ছেড়ে বাঁচার জন্য ক্ষণিকের জন্য হলেও ছুটে আসেন এই নৈসর্গিক উদ্যানে।

এ ছাড়া গোপালগঞ্জ জেলার সদর থানার উজানী রাজবাড়ী, উলপুর জমিদারবাড়ি, কোটালীপাড়ার হরিণহাটি জমিদার বাড়ি ও সদর থানার আড়পাড়া মুনসি বাড়িতে একটি দর্শনীয় পিকনিক স্পট রয়েছে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে-

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যয়ন	**মে-জুন, ২০০২**
উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ন	**জুলাই, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**অক্টোবর, ২০০৩**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অংশীদারদের আলোচনা, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।